International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 296-303
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.223

বাংলা মঙ্গলকাব্যে লিঙ্গ ভাবনার সামাজিক প্রভাব, নারীর কণ্ঠস্বর ও নারীর দাবি

ড. সবিতা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the social implications of gender discourse, women's voices, and their claims as reflected in Bengali Mangal Kavyas, a significant genre of medieval Bengali literature. While primarily composed to glorify deities and promote religious ideals, these texts simultaneously portray the socio-cultural realities of their time, especially the condition of women within a patriarchal framework. The study highlights the paradoxical representation of women—on one hand, divine female figures such as Manasa, Chandi, and Kali are depicted as powerful and authoritative; on the other hand, human women are shown as subordinate, marginalized, and confined within restrictive social norms.

Through the analysis of key narratives from Manasamangal, Chandimangal, and Dharmamangal, the article demonstrates how female characters articulate resistance, resilience, and agency, often negotiating their positions within oppressive structures. Figures like Behula, Khullana, and Vidya embody both traditional ideals of devotion and emerging assertions of selfhood and rights. The paper also emphasizes how women's demands—whether for recognition, justice, or autonomy—are expressed both symbolically and explicitly.

Furthermore, the study situates these literary representations within their broader social impact, arguing that Mangal Kavyas functioned as cultural mediums through which women could indirectly express collective experiences and aspirations. Despite being rooted in patriarchal ideology, these texts subtly contributed to the evolution of gender consciousness and laid an early foundation for later feminist thought in Bengali literature.

Keywords: Gender discourse; Mangal Kavya; Women's voice; Patriarchy; Medieval Bengali literature

ভূমিকা:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য এক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যধারা, যেখানে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যগানের আড়ালে ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রচার যেমন ঘটেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রও। এই সাহিত্যধারার পটভূমিতে ছিল রাজনৈতিক রদবদল ও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত, যা বাংলা সমাজের কাঠামোতে নতুন মাত্রা এনেছিল। মুসলিম শাসনের প্রভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান আরও সংকুচিত হয়, যদিও নারীর অবরুদ্ধ জীবনের সূচনা তারও পূর্বে ঘটে। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারীদের পর্দাপ্রথা, অন্দরমহলে আবদ্ধ জীবন ও একপাক্ষিক পুরুষ আধিপত্যের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়।

বাস্তবিক অর্থে, মুসলিম শাসনের আগেই সমাজে নারীরা অবরোধবাসিনী হয়ে উঠেছিল, তবে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্র আরও কঠোর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীর প্রতি এই শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক

নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে পর্দাপ্রথা, উপপত্নী প্রথা, ক্রীতদাস প্রথা, ক্রীতদাসী বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদে পুরুষের একতরফা ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতাকে আরও সীমাবদ্ধ করে তোলে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় তপধীর ভট্টাচার্য তাঁর নারী সত্তা: নারীর ভুবন, নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে গ্রন্থে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

> "নারী পুরুষের মাপকাঠিতে বিচার্য। যা অন্ধকার, যা কুৎসিত, যা বর্জ্য, যা ঘৃণ্য, যা অনাকাঙ্ক্ষিত— সেইসব দিয়েই যেন গড়ে ওঠে শরীরিণী নারী। নারীদেহ কাম্য, উপভোগ্য, মর্দিতব্য; অতএব নারী হলো কামিনী। আবার বিচিত্র আত্মপ্রতারক কূটাভাসে এই কামিনীকে ধর্মগুরুরা বলেছেন পরিত্যাজ্য। পুরুষের তৈরি শাস্ত্র বলেছে, কামিনীরা পুরুষের মেধা-বুদ্ধি-রক্ত শুষে নেয় জোঁকের মতো।" [১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্য কেবল ধর্মীয় আখ্যান নয়, বরং মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের কণ্ঠস্বর এবং লিঙ্গভিত্তিক বাস্তবতা অনুধাবনের একটি মূল্যবান সাহিত্যিক দলিল। এই কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

লিঙ্গ ভাবনা মানুষের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি সামাজিক নির্মাণ। একজন মানুষের পরিচয় নির্ধারণে লিঙ্গ কতটা গুরুত্বপূর্ণ— এ প্রশ্নটি আজও তর্কযোগ্য। মানুষ জন্মায় নির্দিষ্ট শারীরিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যা তাকে 'সেক্স' বা জৈবিক লিঙ্গ পরিচয় দেয়। কিন্তু 'জেন্ডার' হলো সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত একটি ধারণা, যা মানুষের জন্মগত নয়— বরং সে তা আয়ত্ত করে সমাজের বিধিনিষেধ, রীতিনীতি ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

জন্মের পর থেকেই সমাজ নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা ভূমিকাকে নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই কাঠামোর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে তাদের লিঙ্গ পরিচয়। ফলে, লিঙ্গ কেবল একটি জৈবিক বিষয় নয়, বরং তা সামাজিক শক্তির একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, যা নারীকে দীর্ঘকাল ধরে এক প্রান্তিক অবস্থানে আবদ্ধ রেখেছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা, সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নানা চিত্র মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কাব্যগুলি শুধুমাত্র ধর্মীয় আখ্যান নয়; বরং নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার বিন্যাসের এক সাহিত্যিক দলিল। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ; এই কাব্যগুলোর শ্রবণে অকল্যাণ নাশ হয় বলে ধারণা ছিল। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই কোনো না কোনো দেবতার গুণগান ও বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, এবং কালীমঙ্গল-এর মতো কাব্যগুলিতে নারীদের বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যে দেবীর শক্তি ও মানবী নারীর অধীনতা: এক বিপরীতমুখী বাস্তবতা:

বাংলা মঙ্গলকাব্য একাধারে ধর্মীয় বর্ণনা ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতিফলন। এই সাহিত্যে দেবী চরিত্রগুলি যেমন সর্বশক্তিময়ী, তেমনি মানবী নারীরা সমাজে পুরুষ-নির্ভর, অবদমিত ও অধীনতার প্রতীক। এই দ্বৈত বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় নারীচিত্রের একটি বিচিত্র রূপ তুলে ধরে—যেখানে আধ্যাত্মিক জগতে নারী সর্বশক্তিময়ী দেবী, আর পার্থিব জগতে সে নিষ্পেষিত মানবী। আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দ্বৈত বাস্তবতা প্রশ্ন তুলতে শেখায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতিমূর্তি অর্থাৎ দেবীর আরাধনা হয়, অথচ সেই নারীকেই পিতৃতন্ত্রের অধীনে থাকতে হয়। সমাজ একদিকে নারীর স্বরূপ মূর্তি কে পূজা করে, আর অন্যদিকে তাঁর মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে। এই দ্বৈততা শুধুই সাহিত্যিক নয়, বরং এক গভীর সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন।

দেবী-প্রধান কাহিনিতে নারীশক্তির সংকট ও প্রতিষ্ঠা: বাংলা মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশই স্ত্রীদেবতাকে কেন্দ্র করে রচিত। দেবীরা প্রায়শই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃতি ও পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন। মনসামঙ্গল কাব্যে নাগদেবী মনসা শিবভক্ত বণিক চাঁদ সওদাগরকে তাঁর পূজায় রাজি করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চাঁদ সওদাগর মনসাকে "তুচ্ছ নারী", "অবৈধ নারী" মনে করে পূজা দিতে অস্বীকার করেন। যা সেই যুগের পিতৃতান্ত্রিক অহংকারের প্রতিফলন। দেবীর অবমাননায় মনসার ক্রোধে চাঁদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে; একে একে ছয় পুত্র সাপের দংশনে মারা যায়, সম্পদ নষ্ট হয়। তবু চাঁদ অনড় থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মনসাকে তুষ্ট করতে এগিয়ে আসতে হয় নারীকেই – চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলাকে। মনসার সাথে চাঁদের এই দ্বন্দ্ব আসলে পিতা ও কন্যাতুল্য শক্তির দ্বন্দ্বের রূপক। মনসার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই নারীর আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। সেই অর্থে মনসার এই চাওয়া সমাজচেতনার পরিসরে নারীর কর্তৃত্বসত্তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। অর্থাৎ মনসার পূজার দাবি আসলে নারীর নিজ অধিকার ও প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতীক।

মনসা তাঁর নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুরুষ যেমন আর সকলের সাহায্য নেয়, মনসা কিন্তু কোন পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের এবং সখী নেতার পরামর্শে নিজ কার্যোদ্ধার করেছেন। নারী মুক্তির স্বাক্ষর হিসেবে বাংলার মনসামঙ্গলকে সকলের উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। রূপা ভট্টাচার্য তাঁর "মেয়েদের কবিতা আরেক পৃথিবী।" তে লিখেছেন-

> "নারীর নিজস্ব পরিসর খুঁজে পাওয়ার জন্য নারী-মুক্তির এই লড়াই কখনও পথে এনে দিয়েছে বিক্ষোভ, তো কখনও আবার তা হয়েছে বিপ্লবী বীরত্বের স্বাক্ষর। এই পাওয়া, না পাওয়া, হারানো ও বেদনার আত্মকথাই ধাপে ধাপে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নারী উত্তরণের, নারী আন্দোলনের আখ্যানকে।"[২]

অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীও পিতৃতান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিকে নিম্নবর্গের শিকারিকে রাজা করে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য (পূজার প্রচারক) গড়ে তোলেন, অন্যদিকে ধনাঢ্য বণিক সমাজে নারী সদস্যের মাধ্যমে (ধনপতির স্ত্রী) তাঁর অবাধ্য স্বামীকে দেবীর পূজায় আকৃষ্ট করেন। এভাবে মঙ্গলকাব্যে দেবীকেন্দ্রিক কাহিনিগুলোতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নারীর দ্বন্দ্ব এবং নারীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সামাজিক বার্তা নিহিত থাকে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবী ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারে নারীর সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। রূপসী সুন্দরী চরিত্রটি দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করেন, যা নারীর ধর্মীয় ভূমিকার প্রভাব বোঝায়। অন্যদিকে, কালীমঙ্গল-এ দেবী কালী নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং সমাজে তাদের প্রতি হওয়া অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিশোধের দেবী হিসেবে আবির্ভূত হন। এটি নারীর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ, যা পরবর্তী কালে বাংলার লোকাচার ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

মানবী চরিত্রে নারীর কণ্ঠস্বর ও ভূমিকা: মঙ্গলকাব্যে দেবীর পাশাপাশি মানবী নারীচরিত্রদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মনসামঙ্গলের বেহুলা সেই যুগের আইকনিক নারী, যিনি পতির জীবনের জন্য অসাধারণ ত্যাগ ও সাহসিকতার নজির স্থাপন করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজ বা পরিবারের পুরুষরা যেখানে অসহায়, সেখানে বেহুলা লৌহনৌকায় করে স্বামীর মৃতদেহসহ যাত্রা করেন এবং স্বর্গলোকে দেবতাদের নাচ দেখিয়ে তাঁদের প্রসন্ন করেন। যদিও এটি সতীত্ব ও স্ত্রীর কর্তব্যের আদর্শ রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও বেহুলার লড়াই এক অর্থে সমাজের নিয়ম ভেঙে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি নিদর্শন।

দেবতাদের অনুরোধে মনসা সকল মৃত সন্তানকে জীবিত করেন এবং চাঁদ সওদাগর সব হারানো ধনসম্পদ ফিরে পান। বেহুলা দেবী মনসাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি শ্বশুর চাঁদ সওদাগরকে দেবীর পূজায় রাজি করাবেন এবং শেষ পর্যন্ত বেহুলার অনুরোধেই চাঁদ সওদাগর মনসার পূজায় সম্মত হন। পুরুষতন্ত্রের ঔদ্ধত্য যেখানে ব্যর্থ, সেখানে নারীর ধৈর্য ও কণ্ঠস্বর সফল হয়ে দেবীর দাবিকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে। বেহুলা মধ্যযুগীয় আদর্শ নারীর প্রতিমূর্তি— একনিষ্ঠ পতিব্রতা স্ত্রী। সমাজে এই ধরনের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে একদিকে নারীর সহনশীলতা ও সতীত্বের মহিমা প্রচারিত হয়েছে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে নারীর দৃঢ়সংকল্প ও দক্ষতার কাহিনীও স্বীকৃতি পেয়েছে। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকা মনসার গোপন উপাসক ছিলেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে নারীরা অনেক সময় পুরুষের অজ্ঞাতে নিজেদের বিশ্বাস ও ইচ্ছাকে লালন করতেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উচ্চবর্ণের কুলীন সমাজে নারীদের অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। ফুল্লরা সঞ্জয় কেতুর কন্যা, কালকেতু স্ত্রী। সে প্রতিব্রতা আবার কখনো বিদ্রোহী নারী । সে পরিশ্রমী। সে হাটে উপার্জনের জন্য বেচাকেনা করতো। একদিন ঘরে এসে ফুল্লরা দেখে এক পরমা সুন্দরী তার ঘরে রয়েছে। ফুল্লরা তাকে চলে যাওয়ার শত অনুরোধ করে। দুঃখের কথা শোনায়। কিন্তু সে ঘর ছাড়ল না। তখন ফুলোরা বাধ্য হয়ে গোলা হাটে স্বামীর কাছে আসে। এখানে ফুল্লরা তার স্বামী দেবতাকে যে ভাষায় অভিযুক্ত করল তাতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহী নারী সত্তার জাগ্রত রূপ।

"পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার সরসী কন্যা আনিছো ঘরে।।
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আঁখিটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী" [৩]

বণিক ধনপতির দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বহুবিবাহ প্রথায় নারীর দুরবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রথম স্ত্রী লাহনার ঈর্ষা ও কুটিলতায় নির্দোষ খুল্লনা অপবাদ ও অত্যাচারের শিকার হন। শেষ পর্যন্ত দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদে খুল্লনার নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যায়ের শাস্তি হয়— এ এক নারীর ন্যায়ের জয়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা প্রভৃতি নারী চরিত্র "কেউই অস্পষ্ট নয়, কেউই গতানুগতিক নয়" – প্রতিটি চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা ও মানসিকতা কবি সূক্ষ্মভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। খুল্লনা যেমন মমতাময়ী ও ধার্মিক, তেমনই তিনি সতীন লহনার অত্যাচার নীরবে সহ্য করলেও অবশেষে সত্য উদ্ঘাটনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে লাহনা চরিত্রের মধ্যেও মানবীয় অসূয়া ও অনুতাপের উপাদান আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য মধ্যে যে সমস্ত নারী চরিত্রের সন্ধান মেলে, তারা হল- ১) রঞ্জাবতী, ২) কানড়া, ৩) কলিঙ্গা, ৪) লক্ষ্মী ডোমনী, ৫) সুরিক্ষা, ৬) নয়ানী, ৭) ভাজন বুড়ি, ৮) হীরা নটিনী, ৯) দুর্গা, লাউসেনের আরও দুই স্ত্রী বিমলা এবং অমলা, জয়া, বিদ্যা, রসবতী, নীলা প্রমুখ পরিচয় মেলে।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্য-মধ্যে যে সমস্ত নারী চরিত্র রয়েছে তার মধ্যে ভাস্বর রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা ও বর-লাভের মধ্যে দিয়ে কবিরা আমাদের পরিচয় ঘটান তার সঙ্গে। মধ্যযুগীয় বাতাবরণে একবারে অকৃত্রিম এবং বীর যোদ্ধা লাউসেনের যথার্থ সহধর্মিনী রূপসী কানড়া। নারী চরিত্রের মধ্যে লাউসেন-পত্নী কানড়া পাঠক হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে। এই চরিত্রটির মধ্যে কবিরা এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। কানড়া রণ-রঙ্গিনী দুঃসাহসী যোদ্ধ। রাঢ়ের খাঁটি জাতীয় চরিত্র কানড়া। ঘনরামের কাব্যে কানড়ার প্রথম সাক্ষাৎ মেলে ষোড়শ সর্গে। কানড়া হরিপাল তনয়া। গৌড়-রাজের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে কানড়া প্রতিবাদ করে বলেছে-

"উচিত বলিতে বাপা লাজ ভয় কি। কোন বুদ্ধে বুড়া বরে বিলাইবে ঝি।। কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে। বড় ভাগ্যে ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁচে।।" [৪]

দেবীর আদেশে কানড়া বলেছে যে জন এক কোপে লোহার গন্ডাকে এক-কোপে দু'খণ্ড করতে পারবে তার গলায় বরমাল্য দিবে। যখন এই দুঃসাধ্য কাজ কেউ সম্পাদন করতে পারল না তখন সবাই মিলে কানড়াকে সভা মধ্যে ঢেকে এনে তাকে ধর্ষণ করতে চাইছে সমাজের মাথারা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী যে পায়ের দাসী, অবলা, তার চিত্রও খুঁজে নিতে আমাদের দেরী হল না। এভাবে মঙ্গলকাব্যের মানবী নারীরা কখনো বিধ্বস্তা নায়িকা, কখনো অবিচল নায়িকা রূপে কাহিনির গতিপথ নির্ধারণ করেছেন এবং সমাজে নারীর সুখ-দুঃখের কণ্ঠস্বরকে প্রতিফলিত করেছেন।

নারীর দাবির প্রকাশ ও কণ্ঠস্বরের বিবর্তন:

মঙ্গলকাব্যের নারীচরিত্রদের দাবিগুলো কখনো সরাসরি, কখনো প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দেবী মনসার পূজার দাবির মধ্যে যেমন নারীর স্বীকৃতির প্রশ্নটি লুকিয়ে ছিল, তেমনি বেহুলার দাবিটি ছিল স্বামীকে ফেরত পাওয়ার এবং পরিবার রক্ষার (যা আদতে ন্যায়ের দাবি)। এ সকল ক্ষেত্রে নারীরা তাঁদের লক্ষ্য পূরণে ঈশ্বর বা দেবতাদের সাথে সংলাপ স্থাপন করে নিজেদের অভীপ্সা পূরণ করেছেন। তবে আঠারো শতকে এসে বাংলা সাহিত্যে নারীর কণ্ঠস্বর আরও প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হতে শুরু করে।

রাজকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য (অন্নদামঙ্গল এর অন্তর্ভুক্ত) এই বিবর্তনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাজকুমারী বিদ্যা চরিত্রটি সে যুগের প্রথাগত লজ্জা ও নিষ্ঠাকে অতিক্রম করে নিজ ভালোবাসার ইচ্ছা প্রকাশের সাহস দেখিয়েছেন। বিদ্যা স্বয়ং রাজপুত্র সুন্দরের প্রতিচ্ছবি দেখে প্রেমে পড়েন ও দূতীর মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের আয়োজন করেন, যা মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর জন্য অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাকে একজন স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা ও আত্মবিশ্বাসী নারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন: "বিদ্যা স্বাধীন, রুচিশীলা, সাহসী"। তিনি "নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী স্বামী নির্বাচন" করার অধিকার দাবি করতেও কুণ্ঠিত নন, বরং পরিষ্কারভাবে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই
বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায়
আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কিবা হবে ইহার।।"[৫] পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩

বিদ্যার এই আত্মপ্রকাশমূলক পদক্ষেপ নারীর নিজস্ব চাওয়া ও দাবিকে সাহিত্যিক ভাষা দিয়েছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনিতে প্রথমবারের মতো নারীর স্বর এবং দাবিসমূহ স্পষ্ট ও জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আরেকটি অন্যতম নারী চরিত্র হীরা মালিনী। তিনি সমাজের নিচুস্তরের নারী হলেও অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। জীবিকার জন্য হীরা টাকার বিনিময়ে হাস্যরস ও কথার ছলে ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করেন। দোকানদারদের ভয় পান না, বরং নিজের কৌশল, চালাকিপনা ও আত্মনির্ভরতায় তিনি হয়ে উঠেছেন এক আধুনিক মনস্ক নারী।

তার জীবনে অভাব-অনটন থাকলেও তা তাকে দুর্বল করেনি। বরং সেই কষ্টই তাকে গড়ে তুলেছে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী করে। হীরা বিশ্বাস করে, নারীও স্বাধীনভাবে নিজের জীবন বেছে নিতে পারে, এবং

পুরুষের মতোই সম্মানের অধিকার তারও রয়েছে। সে সাবলম্বী ছিল বলেই সুন্দর কে আশ্রয় দিতে পেরেছিল। কোটালের অনুচিত কথায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে সে-

"হীরা বলে আর বেটা, তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা, জানে সর্বজনা।। পৃষ্ঠা সংখ্যা ।৬১৭

এই কথাগুলি নারীর স্পষ্ট ও নির্ভীক কণ্ঠস্বর, যেখানে তিনি নিজের পছন্দ, চাওয়া ও যোগ্যতা নিয়ে নিঃসংকোচে নিজের অবস্থান তুলে ধরছেন। হীরা কেবল প্রেমিকা নন, তিনি সেই নারী যিনি সামাজিক বাধা অতিক্রম করে নিজের সম্মান ও অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাস্তবে সেই সময়ে সমাজে নারীর মতামত বিবেচনা করা হত না, কিন্তু সাহিত্যকে হাতিয়ার করে ভারতচন্দ্র নারীর কামনা-বাসনা ও স্বাধিকারের পক্ষে এক নতুন বার্তা প্রবর্তন করেন। তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাহিনি মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে নারীর অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় এবং পরবর্তীকালের নবজাগরণে নারীর অধিকারের আলোচনা ঘিরে একটি বীজ রোপণ করে।

সামাজিক প্রেক্ষিত ও প্রভাব: নারীর দাবি ও সামাজিক পরিবর্তন:

বাংলা মঙ্গলকাব্যে নারীর কণ্ঠস্বর ও লিঙ্গ ভাবনার যে উপস্থাপন আমরা দেখতে পাই, তা মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও দাবির একটি পরোক্ষ ভাষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই কাব্যগুলির নারী চরিত্ররা, যদিও সমাজের নানান বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ, তথাপি তারা ন্যায়, সম্মান ও স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে। মঙ্গলকাব্য সরাসরি নারীর অধিকারের পক্ষপাতী নয় ঠিকই, তবে অন্তঃস্রোতের মতো তাতে নারীর কিছু সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

দেবী মনসা কিংবা চণ্ডীর আরাধনা তৎকালীন গ্রামীণ সমাজে নারীর লুকায়িত শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি একদিকে শ্রদ্ধা, অন্যদিকে ভীতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্গত সমাজে পুরুষ কর্তৃত্ব প্রচলিত হলেও, এই দেবীচরিত্রগুলোর মাধ্যমে নারীর সর্বশক্তিমান রূপ যখন প্রকাশ পেয়েছে, তখন সাধারণ মানুষ বিশেষত নারীরা অনুধাবন করতে পেরেছেন— নারীও ক্ষমতার আধার হতে পারে। বিশেষ করে দেবীকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করলে তার প্রতিক্রিয়া কতটা ভয়ংকর হতে পারে— এই বিশ্বাস নারীর প্রতি একপ্রকার সামাজিক ভক্তি ও সংবেদনশীলতা সঞ্চার করেছে।

অন্যদিকে বেহুলার কাহিনি গ্রামীণ বাংলায় গান, পাঁচালী ও নাটকের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই গল্প শুধু বিনোদন নয়, বরং নারীর আত্মত্যাগ, সাহস ও ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে নারী শ্রোতাদের মাঝে গভীর আবেগ জাগিয়ে তোলে। ব্রতকথা ও পাঁচালীর মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যের এসব আখ্যান গ্রামীণ নারীদের ঘরোয়া ধর্মাচারে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে, যাকে বলা হয়েছে "বাংলার নারীদের নিজস্ব সাহিত্যিক সম্পদ"। এসব আচার-অনুষ্ঠানে নারীসমাজ নিজেদের আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করার সুযোগ পেত। মনসার ব্রত কিংবা বেহুলার ভাসানগানের মধ্য দিয়ে তারা একত্রে নিজেদের মানসিক যন্ত্রণা ভাগ করে নিতে পারত, যা সমাজে নারীসমাজের একান্ত অনুভব ও সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়।

ফলে, মঙ্গলকাব্যের গল্পসমূহ কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক আখ্যান ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছিল বাংলার প্রান্তিক নারীদের আত্মপ্রকাশ, সংহতি এবং সংগ্রামের এক সাংস্কৃতিক মাধ্যম। সাহিত্য বিশ্লেষকদের মতে, মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত বিস্তার নারীর চারিত্রিক আদর্শ যেমন প্রচার করেছে— যেমন সতীত্ব, সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা— তেমনি নারীর আত্মশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও লড়াইয়ের মনোভাবকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও এসব

কাব্যে নারীর 'আদর্শ' চরিত্র গঠন পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রণীত, তবু সেই আদর্শের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে গিয়েই নারীরা কীভাবে সীমা অতিক্রম করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তা এই সাহিত্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। বেহুলার সংগ্রাম, ধৈর্য ও প্রেম আজও বাংলার লোকচেতনায় নারীর দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে সমাদৃত।

উপসংহার:

বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিবিধ স্তরে লিঙ্গ ভাবনা ও নারীর কণ্ঠস্বর এক বহুমাত্রিক ও দ্বন্দ্বময় রূপে প্রকাশ পেয়েছে। দেবী মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্যগানে নারীর সর্বশক্তিমান রূপ ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত উদ্ভাসিত হয়েছে, যেখানে শেষ পর্যন্ত নারীর অস্তিত্ব ও শক্তিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মানবী চরিত্র যেমন বেহুলা বা খুল্লনার কাহিনিতে দেখা যায়— নারীর সহনশীলতা, আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নারীর নিজস্ব ইচ্ছা ও অধিকারের দাবি আরও স্পষ্ট রূপে উঠে এসেছে, যা মধ্যযুগীয় সমাজে একটি প্রগতিশীল চিন্তার আভাস দেয়।

এইসব সাহিত্যকর্ম কেবল ধর্মীয় ভাবাদর্শ প্রচার করেনি; বরং সমাজের চিন্তাপদ্ধতির গতিপথ নির্ধারণেও প্রভাব ফেলেছে। মঙ্গলকাব্য ধর্মীয় আখ্যানের আবরণে নারীর ক্ষমতা ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কে এক প্রকার সাংস্কৃতিক বোধ জাগিয়েছে। এ কাব্যগুলি একদিকে নারীর সতীত্ব, ভক্তি ও আত্মবিসর্জনের চিত্র তুলে ধরেছে, আবার অন্যদিকে নারীর আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও সম্মান প্রতিষ্ঠার পথকেও উন্মুক্ত করেছে। ফলে মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছে এমন এক সাহিত্যিক দলিল, যা মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর জীবন, সংগ্রাম ও চেতনার এক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

এই কাব্যগুলি শুধুমাত্র অতীতের সাহিত্য নিদর্শন নয়, বরং বর্তমান লিঙ্গ ও নারীবাদী আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। নারীর প্রতিরোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে বহু আগে থেকেই সাহিত্যে দানা বেঁধেছে, মঙ্গলকাব্য তারই এক শক্তিশালী নিদর্শন। যদিও এই সাহিত্য পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রচিত, তবু তা নারীর আত্মজাগরণ ও ক্ষমতায়নের এক প্রাথমিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা পরবর্তীকালে বাংলার সাহিত্য ও সমাজে নারীবাদী চেতনার বীজ রোপণ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, তপধীর নারী সত্তা। নারীর ভুবন, নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে। পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা -১১।

২. ভট্টাচার্য, রূপা । মেয়েদের কবিতা আরেক পৃথিবী। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা ০০৯ বইমেলা ২০১৩, পৃষ্ঠা-১।

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম। চন্ডিকামঙ্গল কাব্য। সন্দীপকুমার মন্ডল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭৩, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ- ৩৬৭।

৪. চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১২, পৃঃ ৪২৯

৫. "ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)" সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। প্রকাশক বাংলীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা, বাংলা ১৩৫০ সালে।পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩

৬. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৭।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. হালদার, গোপাল। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা'। প্রথম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ', কলিকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লি:, ১৩৬৩ পৃষ্ঠা: ১৬৯।

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৬০৭।

৩. সেন, সুকুমার। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৮, পৃষ্ঠা: ১৫১

৪. চক্রবর্তী, ঘনরাম। 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' (পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃষ্ঠা: ৫১।

৫. মিত্র, অমলেন্দু। 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর'। কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃষ্ঠা:৪৩।

৬. গাঙ্গুলি, মানিকরাম। 'ধর্মমঙ্গল' (বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত)। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৭৯।